মুতাজিলা

ইতিহাস ও দর্শন

(কয়েকটি ধ্রুপদি প্রবন্ধের সংকলন)

সম্পাদনা

পুলিন বকসী

প্রকাশন

সম্পাদকের
উৎসর্গ

‘কাজলী’
যে শিশু ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে
জ্ঞানরূপ ধারণ করে জন্ম নেয়
কিন্তু চিরকাল-ই অবিজ্ঞাপিত
থেকে যায়...।

সূচি

সম্পাদকের বয়ান / ০৭
ভূমিকা / ০৯
আল-মুতাজিলা — শুরুর কথা / ১৩
ইসলামি দর্শন—প্রারম্ভিক কার্যকারণ ▪ শিবলী নোমানী / ২৫
মুতাজিলী সম্প্রদায় ▪ ড. আহমদ আমীন / ৪৬
বিশ্বসভ্যতায় মুসলিম দার্শনিকদের দান ▪ জি.সি. দেব / ২১৩
আল-কুরআনের মুতাজিলাপন্থি ব্যাখ্যার কয়েকটি দিক ▪ মজহার উদ্দিন সিদ্দিকী / ২৩০
মুতাজিলা সম্প্রদায় ▪ ড. মো. বদিউর রহমান / ২৫৬
ইসলামে চিন্তার ভূমিকা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ▪ সৈয়দ হোসেইন নসর এর সাথে সাহিল বদরুদ্দীন কথোপকথন ▪ ভাষান্তর: কানিজ ফাতিমা আশা / ২৯০
মুতাজিলা দর্শনে আত্মার স্বরূপ ▪ আনিসুজ্জামান / ৩০৮

সম্পাদকের বয়ান

ইসলাম বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের ধর্ম এবং দৈনন্দিন বাস্তবতা। ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের পর থেকে তা এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান চর্চা, দর্শন এবং বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই, ইসলাম যে দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তালাশের বিষবস্তু হতে পারে– তা এখানকার প্রগতিশীল মহলের প্রধান অংশ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীরাও মনে করেন না। একদিকে প্রগতির তথাকথিত চাপে ইসলামকে 'সেকেলে' ও 'প্রাক-আধুনিক' মনে করার চল দেখা যায়, অন্যদিকে কতগুলো অনড় ও একমুখী ধারণাকে ইসলামের নামে চালাতে দেখা যায়। অথচ ইসলাম এক বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা কিসিমের ধ্যাণধারণা, বিশ্বাস, নৈতিক ও আইনী বিষয়ের সমষ্টি। কাজেই আমরা বরাবরই চেষ্টা করেছি দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের এই প্রচণ্ড বাস্তবতার ও সেই সাথে কালচারিক ইসলামের প্রতি খানিকটা সুবিচার করতে। বর্তমান কিতাব সেই প্রয়াসেরই অংশ।

ইসলাম নিয়ে যে একেবারেই কোনো আলোচনা হয় না, তা নয়। কিন্তু তার গণ্ডি ও আওতা খুবই সীমিত। মাদ্রাসা ও অপরাপর ইসলামিক কেন্দ্রের বাইরে বৃহত্তর যে সমাজ, বিভিন্ন ছোট ছোট বুদ্ধিবৃত্তিক ব্লক তাদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। নিঃসন্দেহে এ এক বড় কূপমন্ডুকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ব্লকগুলোর মধ্যে আগ্রহ নেই কেন? আগ্রহ না থাকার অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। ইসলামকে এ অঞ্চলে, বিশেষত ঔপনিবেশিকতার উদরে উনিশ শতকের 'আধুনিকায়ন' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামকে যেভাবে দেখা হয়েছে, তার মধ্যেই এই আগ্রহহীনতার কারণটা নিহিত আছে। এটা আসলে কখনো মনে করা হয় নাই যে ইসলাম নিয়ে খুব একটা কাজ করা দরকার। ইসলাম সম্পর্কে বেশ কয়েকটি এসেন্সিয়ালিস্ট তথা সারবাদী চিন্তাভাবনা এখানে বেশ প্রবল প্রতাপে বিরাজ করতে দেখা যায়।

ইসলামপন্থী ও প্রগতিশীল– এই দুই মহলই, তাদের আপাত সব বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলামের একক ও সারবাদী বয়ান নির্মাণের ব্যাপারে তারা একমত। আমরা আসলে ঐরকম কোনো সারবাদী জায়গা থেকে ইসলাম কিংবা কোনো দার্শনিক ধারাকেই দেখি না। আমরা কোনো প্রকারের ভিত্তিবাদী জায়গা থেকে ইসলামের

মূল্যায়নে আগ্রহী নই। আমরা মনেকরি কোনো আলাপই শেষ আলাপ নয় এবং প্রত্যেকটি আলাপই উঠে আসা দরকার।

ইসলামের যে বিভিন্ন ফেরকা রয়েছে *মুতাজিলা* তার মধ্যে একটি। *মুতাজিলা*'র যা কথা, *মুতাজিলা* যা বলতে চায় ইসলামের অন্যান্য ফেরকার সাথে তার আন্তরিক যোগাযোগ ও লেনদেন হওয়া দরকার। এমনকি *মুতাজিলা*'র মধ্যেও অনেক মত-দ্বিমত রয়েছে। কোনো মতই শেষ কথা নয় আবার কোনোমতই ফেলনা নয়। একটা মত 'ভুল' হলেও যদি সেটা সমাজে হাজির না থাকে, তাহলে তো সেটাকে না মাড়িয়ে অন্য 'সঠিক' মতে পৌঁছানো সম্ভব হবে না!

ঐতিহাসিক সুদীপ্ত কবিরাজ তত্ত্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা কথা বলেছেন। তিনি বলছেন আমরা যে তত্ত্বগুলি পড়ি, যে তত্ত্বগুলি আমাদের কাজে লাগে সেগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে– সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের রচয়িতা বা লেখকের নিয়ত তদন্ত করা আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত না। আমরা যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে আছি, তা মোকাবিলায় তত্ত্বকে কাজে লাগানোই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখি, যে অঞ্চলে যে ধর্মটি প্রধান সেই ধর্মকে প্রাত্যহিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দার্শনিক চর্চার মধ্যে দিয়ে সমাজের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। এটা না করলে অবশ্যই সেই ধর্ম তখন যারা চর্চা করে এবং যারা বিরোধিতা করে– দুই দিক থেকেই–এটা একটা এক্সট্রিম জায়গায় চলে যায়। সেটা না করতে হলে কেউ কোনো একটা জিনিস মানবে কি মানবে না সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আলোচনাকে গড়াতে দেয়া। এরমধ্য দিয়ে যেটা হয়, আমরা আসলে আমাদের গল্পগুলো একজন আরেকজনের কাছে হাজির করতে থাকি। এখান থেকে কে কারটা কতদূর কি নেবে না নেবে, সেটা পরের ব্যাপার। কেউই পুরোটা নিতে পারবে না আবার কেউই পুরোটা ফেলতেও পারবে না।

অনেক মানুষ কোনো বিষয় চর্চা করার মানেই হলো তার মধ্যে কিছু না কিছু মেরিট নিশ্চই আছে। তারা যা নিয়ে বিচলিত হয়েছে, তাদের সেই বিচলনের গল্পটা জানার প্রতিই আমরা আসলে আগ্রহী। বর্তমান কিতাবটি সংকলনের সিদ্ধান্তের পেছনে এটা একটা প্রধান বিবেচনা হিসেবে থেকেছে।

এই সংকলন ইসলাম কিংবা মুতাজিলা সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো কথা নয়। বলা যায়, কথা শুরুর চেষ্টা মাত্র। এমন একটা জায়গা থেকে বইটিকে উদযাপন করার জন্য পাঠকদের প্রতি আমরা সনির্বন্ধ আহবান রাখছি।

পুলিন বকসী
ঢাকা, ২০২৩

ভূমিকা

সুন্নি কালামতত্ত্বে মুতাজিলাদের 'ভ্রান্ত ফেরকা' হিশাবে গণ্য করা হইলেও, মুসলিমদের চিন্তার ইতিহাসে তাদের অবদান অনেক। মুতাজিলাদের পাঁচ মূলনীতির মধ্যে একটা, *আল মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইন* (কেউ যদি কবিরা গুনাহ করে, এবং তওবা না কইরাই মারা যায়, তাইলে সে মুমিনও না, কাফেরও না — এই অবস্থান) নিয়া বসরার বিখ্যাত সুফি স্কলার হাসান বসরির (২১-১১০ হি.) সাথে তারই দুজন ছাত্র, ওয়াসিল ইবনে আতা ও আমর ইবনে উবায়েদের তর্ক থেকে মুতাজিলা চিন্তার জন্ম।

'মুতাজিলা' নামটা শুনলে কালামশাস্ত্রের একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের কথা মাথায় আসে আমাদের; মাথায় আসে জ্ঞানচর্চার একটা বিশিষ্ট সার্কেলের কথা। তবে কোন কোন স্কলারের মতে, এই কালামি বা জ্ঞানতাত্ত্বিক মুতাজিলারাই ইতিহাসের প্রথম মুতাজিলা না। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) খুন হওয়ার পর উদ্ভুত পরিস্থিতিতে, আলি-মুয়াবিয়া দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে যারা কোন এক পক্ষে না গিয়া নিউট্রাল পজিশনে ছিলেন, তাদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসে 'মুতাজিলা' নামের ব্যবহার পাওয়া যায়। সেইসূত্রে কার্লো আলফনসো নালিনোর (১৮৭২-১৯৩৮) মতো কোনো কোনো স্কলার মনে করেন, ওয়াসেল ইবনে আতার প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবৃত্তিক মুতাজিলিজম ছিল এই রাজনৈতিক মুতাজিলিজমেরই ধারাবাহিকতা।

মুতাজেলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার কেন্দ্রে আছে 'আকল' বা মানুশের বোধবুদ্ধি দিয়া 'নকল' বা ওহিরে বোঝা ও ব্যাখ্যার চেষ্টা। এই চেষ্টায় তারা গ্রিক দর্শন থেকে ঋণ নিছেন, ঋণ নিছেন ইসলামি চিন্তা থেকেও। মুতাজিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মুভমেন্ট এত প্রবল ছিল যে, সুন্নি কালামের পরবর্তী ধারা বা স্কুলগুলা (যেমন: আশ'আরি বা মাতুরিদি) মুতাজিলা চিন্তার পর্যালোচনা করতে গিয়াই তৈরি হইছে বলা চলে। এমনকি, আশ'আরি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আশ'আরি নিজেও ছিলেন প্রাক্তন-মুতাজিলা। তবে, আকল বা বুদ্ধির মসিবত নিয়া মুতাজিলারা খুব একটা ক্রিটিক্যালি ভাবেন নাই বলে মনে হয়। তাছাড়া, জ্ঞানের সাথে মানুশ ও ক্ষমতার সম্পর্ক প্রশ্নেও মুতাজিলারা ছিলেন মোটাদাগে 'অসতর্ক'। যার ফলে, ইসলামি চিন্তার ইতিহাসে তারা যে পজিশন পাইতে পারতেন, তা পান নাই।

কথাটা একটু খোলাসা করি। হাসান বসরির লগে ওয়াসেল ইবনে আতার তর্কটা ধইরাই আগাই। একজন মানুশ যখন বড় কোন গুনাহ করে, তখন সে কি আর মুসলমান থাকে? মুমিন থাকে? হাসান বসরি ওয়াসেল ইবনে আতার এই প্রশ্নের জবাবে বলছিলেন যে, হাঁ, সে মুমিন থাকে। ওয়াসেল আতা এই সিদ্ধান্ত মানতে

রাজি ছিলেন না। মুতাজিলাদের মতে, বিশ্বাস যদি কাজে প্রতিফলিত না হয়, তাইলে সেইটা আর কেমন বিশ্বাস! ফলে তাদের মত হইল, বড় গুনাহ করলে মানুশ মুমিনও থাকে না, কাফেরও হয় না; সে দুইটার মাঝামাঝি কোন অবস্থানে থাকে।

এই চিন্তার মুশকিল হইল, মানুশের কাজ সবসময় তার চিন্তা বা বিশ্বাসের অনুবর্তী হয় না। ভালো/খারাপ দুই ধরনের ইন্সটিংক্ট আছে দেইখাই মানুশ মানুশ হইতে পারছে। বা এই কারণেই মানুশের 'স্বাধীন ইচ্ছা' কথাটা অর্থবহ। কিন্তু মুতাজিলারা মানুশের চিন্তা/বিশ্বাস আর অ্যাক্টের মধ্যে যে ধরনের সামঞ্জস্যতা দাবি করছেন, তা মানুশের বেসিক ইন্সটিংক্ট বিরোধী। সুন্নি কালামের অন্য স্কুলগুলার সাথে তুলনা করলে, মুতাজিলাদের এই পজিশনরে বেশ 'কট্টর'ই মনে হবে অনেকের; আশ'আরি বা মাতুরিদিদের মতে, গুনাহ করলেও মানুশ 'মুমিন'ই থাকে। তবে তার ঈমান বাড়ে-কমে।

মুতাজিলারা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করলেও, জ্ঞানের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়া তাদের প্রাক্টিক্যাল সচেতনতা বা ক্রিটিক্যাল কোন পজিশন ছিল বইলা মনে হয় না। পাঠকেরা জানেন যে, আব্বাসি আমলে আল-মামুনের সময় মুতাজিলা চিন্তা ছিল স্টেট স্পন্সরড ডকট্রিন। মামুন সেসময় প্লেটো-কথিত 'ফিলোসফার কিং' হইতে চাইছিলেন হয়ত; তাই ধর্মীয় স্কলার বা হুজুরশ্রেণীর কাছ থেকে ধর্মীয় অথরিটি নিজের হাতে নিতে চাইছিলেন। মুতাজিলারা তাতে সায় দিছেন মনেপ্রাণে। কিন্তু জ্ঞানের অথরিটি শাসকের হাতে গেলে, এর কী পরিণতি হয়, তা নিয়া মুতাজিলাদের খুব একটা সচেতনতা ছিল না বলেই মনে হয়।

ফলে 'কোরআন সৃষ্ট না অনাদি', এই তর্কের ফয়সালা করার দায়িত্ব মুতাজিলারা মামুন তথা রাষ্ট্রের কান্ধে তুইলা দিলেন। মানুশের চিন্তা বা বিশ্বাসের শুদ্ধতা ও চিন্তার সাথে কাজের সামঞ্জস্য ব্যাপারটারে মামুন এতটাই সিরিয়াসলি নিছিলেন যে, এই তর্কের জেরে উনি তখন নানা মত ও পথের মানুশরে আটক করলেন, খুন করলেন, পুরা সাম্রাজ্যে ডিক্রি জারি কইরা এই চিন্তা প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন করলেন।

ফলাফল যা হওয়ার, তাই হইছিল। মুতাজিলা চিন্তার প্রভাব প্রায় পুরাটাই খর্ব হইছে ওই 'মিহনা'র ঘটনার মধ্য দিয়া। পরবর্তীতে যে শাসক আসছে, তারা নানা প্রাক্টিক্যাল কারণেই আর মুতাজিলা চিন্তারে প্রমোট করেন নাই। আর ওই মিহনার প্রতিক্রিয়ায়ই, সালাফি বা আসারি কালাম কেবল প্রমিন্যান্ট হইছে তা না, বরং কালামের আরসব ধারারেও (যারা মানুশের বুদ্ধি বা আকলরে গুরুত্ব দিতে চায়, যেমন: আশ'আরি, মাতুরিদি) সামাজিকভাবে বেশ চাপের মুখে ফেলছে।

মানুশের ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাস বা জ্ঞান কীভাবে কাজ করে, মানুশের সোসাইটি ও রাষ্ট্রের সাথে জ্ঞানের আঁতাত ঘটলে তার ফলাফল কী হইতে পারে—এইসব বিষয়ের মোকাবেলা করতে না পারায়, মুতাজিলা চিন্তা শেষমেশ শাসকের কর্তৃত্ববাদী চিন্তার জায়গা দখল করছিল। যা তাদের জন্য ভালো হয় নাই। ভালো হয় নাই আমাদের জন্যেও। কালামি তর্কগুলার মধ্য দিয়া ইসলামি চিন্তায় মানুশের আকলরে উন্মোচিত করার যে সম্ভাবনাগুলা তৈরি হইছিল, চিন্তারে ইডিওলজি বানাইতে গিয়া মুতাজিলারা সেই সম্ভাবনা খর্বও করছিল অনেকাংশে।

মুতাজিলারা মানুশের বুদ্ধি ও আকলরে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু দিতে গিয়া, মানুশের উপর সে এমন অনেক দায়-দায়িত্ব চাপায়, যা মানুশ সামলাইতে অক্ষম। ধরা যাক, বিশ্বাসের সাথে কাজের পুরাপুরি মিল—এইটা এমন এক দায়িত্ব, যা মানুশের সাধ্যাতীত। খালি আকলের বিবেচনায় ভালো-মন্দের ভেদ করাও মানুশের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মুশকিল। আবার, মুতাজিলাদের চিন্তায় এই 'আকল' কিন্তু 'সেক্যুলার আকল' না, এইটাও মাথায় রাখা লাগবে। মুতাজিলারা কোরআনরে সৃষ্ট বলছিল যেসব কারণে, তারমধ্যে একটা বড় কারণ ছিল এই যে, কোরআন অনাদি হইলে আল্লাহর সাথে শিরক হয়; আল্লাহর অ্যাবসল্যুট 'তাওহিদ' বা 'একত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলে, মুতাজিলাদের ব্যবহৃত 'আকল' বর্গটা মোটাদাগে কালামি বর্গই ছিল; একালের সেক্যুলার 'রিজন' অর্থে নিলে ওই আকলের মর্মোদ্ধার অনেকাংশেই সম্ভব হবে না।

আক্কেলের বিপদ ধরতে না পারা, মানুশের আক্কেলরে অসীম গুরুত্ব দিয়া 'ন্যায়-অন্যায়'র মাপকাঠি বানাইতে গিয়া তার উপর সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপায়ে দেওয়া, ক্ষমতার সাথে জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পর্ক না বোঝা—আমার মতে এই তিনটা জিনিশ মুতাজেলি চিন্তার মূল ঝামেলা।

তবু এসবের কারণে মুতাজেলি চিন্তার গুরুত্ব শেষ হয় না। বিশেষত, আজ যেভাবে মুতাজিলাদের স্রেফ 'ভ্রান্ত ফেরকা' বইলা দেওয়া হয়, ইতিহাস ঘাঁটলে দেখি যে, উমাইয়া/আব্বাসি আমলের বসরা বা বাগদাদের কালামি সার্কেলগুলাতে ব্যাপারটা এমন ছিল না। তাদের চিন্তা থেকেও অনেক নিছেন অন্যান্য স্কুলের কালামিরা। আরও মজার ব্যাপার হইল, মুতাজিলাদের বড় একটা অংশ ফিকহি স্কুল হিশাবে হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। ফলে সেলজুক উজির আল-কুন্দুরির আমলে জ্ঞানের শহর নিশাপুরে আশ'আরি-শাফেয়িদের উপর যে রাষ্ট্রীয় অত্যাচার নাইমা আসে, তাতে উস্কানি দেওয়া মুতাজিলা আলেমদের প্রায় সকলেই ছিলেন হানাফি। বর্তমানে কোন আলেম এই কাহিনী লেখলে, ওই উস্কানিদাতা আলেমদের 'মুতাজিলা' পরিচয়টাই হয়ত বলবেন কেবল, হানাফি পরিচয়টা আর বলবেন না।

ঐতিহাসিকভাবে মুতাজিলা চিন্তার অবদান ও খামতি নিয়া পর্যালোচনা জরুরি। তাছাড়া, এই চিন্তার সাথে অন্যান্য কালামি ও ফিকহি স্কুলের বিরোধ, সাদৃশ্য ও সেসবের জ্ঞানতাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণ চিহ্নিত করাও দরকারি।

বাঙলায় ইসলামি জ্ঞানচর্চার সূচনা ও বিকাশের ইতিহাস নিয়া লেখাপত্র বেশ কম। স্বাভাবিকভাবেই, মুতাজিলা চিন্তা নিয়াও কাজের বইপত্র তেমন পাওয়া যায় না। এই অভাব দূর করতে এগিয়ে আসছেন শ্রদ্ধেয় পুলিন বকসী। বইয়ের প্রবন্ধগুলা সুনির্বাচিত, বলাই লাগবে। মুতাজিলা চিন্তা নিয়া আগ্রহীদের বেসিক জ্ঞানের অভাব অনেকাংশেই দূর করবে এই বই, পাণ্ডুলিপি পইড়া আমার এমন মনে হইছে। আরও মনে হইছে, বইটা মুতাজিলা চিন্তার প্রতি পক্ষপাতমূলক। এবং এই পক্ষপাত প্রদর্শনে যেসব প্রবন্ধ বইতে নিয়া আসছেন সম্পাদক, সেগুলার আর্গুমেন্টও বেশ মজার। ফলে, তত্ত্ব ও তথ্য দুইদিক থেকেই, মুতাজিলা চিন্তা নিয়া নানা ধরনের নতুন প্রস্তাবনা হাজির করার একটা সম্ভাবনাও রয়ে গেছে বইটার মধ্যে। 'ভ্রান্ত ফেরকা' ধরনের কালামি বিবাদের বাইরে গিয়া, ইসলামের ডিসকার্সিভ ট্রাডিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন 'অবস্ট্র্যাকট' চিন্তা নিয়া সিরিয়াস আলাপের যে মওকা তৈরি করল বইটা, তা আনন্দের।

এই বইয়ের সাথে সচেতন পাঠকের সফর মজারই হওয়ার কথা। বাঙলাভাষায় ইসলামি চিন্তাচর্চার ইতিহাস আরও ব্যাপক, ফলদায়ী ও প্রভাববিস্তারী হবে— আমি এ ব্যাপারে আশাবাদী। আর এ কাজের একজন আগ্রহী উদ্যোক্তা হিশাবে, পুলিন বকসী ও তার বইয়ের প্রতি আমার সর্বাত্মক শুভকামনা।

তুহিন খান
কবি, লেখক ও অনুবাদক
সাদ্দাম মার্কেট, ঢাকা

আল-মুতাজিলা — শুরুর কথা

[আর যেসব বিপদ-আপদ তোমাদের উপর
পতিত হয়- তাতো তোমাদের স্বহস্তে অর্জিত
এবং অনেক পাপতো তিনি ক্ষমা করে দেন।

—সুরা আশশুরা, ৩০]

যে ধর্মতাত্ত্বিক দল ইসলামি ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত যুক্তিমূলক মতবাদকে সর্বপ্রধান সূত্র হিসাবে গ্রহণ করে সেই দলের নাম আল-মুতাজিলা। মাসউদি'র মুরূজ[১] হতে নামটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেন, যারা ইতিযালের মতবাদ মেনে চলে তারাই মুতাজিলা অর্থাৎ যারা 'মানযিলাতুন বায়না'ল-মান-যিলাতায়ন'-এ নীতি [বিশ্বাস (ঈমান) ও অবিশ্বাসের (কুফর) মধ্যবর্তী এক তৃতীয় অবস্থা] স্বীকার করে, তারাই হল মুতাজিলা। এটাই তাদের মূলনীতি। 'আহলুল-হাদিস' দলের পক্ষ হতে এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। তা-এরকম, 'মানযিলাতুন বায়না'ল-মান-যিলাতায়ন' নীতি স্থির করার পর ওয়াসি'ল ইবনে আতা ও আমর ইবনে উবায়দ একটি পৃথক দল গঠনের জন্য হাসান আল-বাসরি'র দল থেকে আলাদা হয়ে যান (ই'তাযালা); বরং বলা হয়ে থাকে যে, হাসানই তাদেরকে 'সরে পড়' (ইতাযিলা) বলে নিজের অনুসারী দল থেকে বের করে দেন। তারা ও তাদের অনুসারীগণ মুতাজিলা নামে পরিচিত হন। এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য হলেও এ ঘটনা হতেই যে তাদের ঐ নামকরণ হয় তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ মুতাজিলারা তাদের এই নামের জন্য গর্ব অনুভব করত। এই নাম যদি তাদের শত্রুদের দেয়া অবজ্ঞাসূচক নাম হত তাহলে তারা কখনও তাতে গৌরব অনুভব করত বলে মনে হয় না। এই মত নির্ভুল বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ মুতাজিলারা নিজেদের ঐ নামে আখ্যায়িত না করে বরং 'আহলুল-আদল ওয়া'ত-তাওহীদ' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে এবং হাসান আল-বাসরীর ঐ উক্তির কারণেই সুন্নীগণ তাদেরকে মুতাজিলা (সুন্নীদল পরিত্যাগকারী) আখ্যা দেয়।

উৎপত্তি ও রাজনৈতিক ইতিহাস:

রাজনৈতিক কারণেই যে মুতাজিলাদের উৎপত্তি এবং শীয়া ও খারিজি আন্দোলনের অনুরূপ পরিবেশ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই যে মুতাজিলীদের উদ্ভব হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামের ইতিহাসের ধারায় হযরত আলী (রা.)-র খিলাফাত লাভ একটি বিরাট ঘটনা। এটা সবাই জানে যে, হযরত আলী (রা.)

১. *মুরাজ-খন্ড-৬, পৃ-২২*

তৎকালীন সাহাবীদের নিকট থেকে যে আনুগত্য দাবি করেন, তা স্বীকার করতে যারা অসম্মত হন অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যারা তাতে সম্মত হন তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়র (রা.), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.), মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা.), উসামা ইবনে যায়দ (রা.), সু'হায়ব ইবনে সিনান (রা.) ও যায়দ ইবন ছাবিত (রা.)[২]। এদের মধ্যে তালহা ও যুবায়র (রা.) আলী (রা.)-র বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হন কিন্তু অধিকাংশই নিরপেক্ষ থাকেন। মদীনার লোকেরা সাধারণত শেষোক্ত নিরপেক্ষদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। বসরাতে আল-আহনাফ ইবনে কায়স ৬০০ তামীমীসহ এবং সাবরা ইবন শায়মান একদল আয্দীসহ এই ফিতনা থেকে দূরে সরে থাকেন।[৩] এই নিরপেক্ষদের কথা বর্ণনা করতে 'ই'তাযালা' ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই দেখা যায় যে, পূর্বেও হযরত আলী (রা.) এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে নিরপেক্ষ থাকা অর্থে 'ই'তাযালা' রাজনৈতিক শব্দে পরিণত হওয়ার সূত্রপাত হয়। আন-নাওবাখতী একটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন —

> আলী (রা.) খলীফা হলে এরা পৃথক হয়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও উসামা ইবনে যায়দ (রা.)-এর অনুসরণ করে। এরা আলী (রা.)-র নিকট বায়'আত গ্রহণ এবং তাকে খলীফা স্বীকার করে থাকলেও তার দল থেকে পৃথক হয়ে যান (ইতাযালু), অথচ তার বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বা পক্ষ অবলম্বন করতে অস্বীকার করেন। এদেরকে মুতাজিলা বলা হত এবং সম্ভবত এরাই পরবর্তী সমস্ত মুতাজিলা'র পূর্বসূরি।[৪]

কাজেই ধর্মতাত্ত্বিক দল মুতাজিলার অস্তিত্বের পূর্বে রাজনৈতিক মুতাজিলা থাকা অসম্ভব না। রাজনৈতিক মুতাজিলা হতে ধর্মতাত্ত্বিক মুতাজিলা নীতির আভাস নাও-বাখতির এই বয়ান থেকে পাওয়া যায়।

এই ধর্মতাত্ত্বিক দলের স্থপতিদের সম্পর্কে যা লিখিত হয়েছে, তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এরকম অনুমান করা যেতে পারে। কথিত আছে যে, ওয়াসিল ইবনে আতা ও আমর ইবনে উবায়দ নামক বসরার দুই পণ্ডিত ব্যক্তি এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া খালীফা হিশাম ও তার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকাল (১০৫-১৩১/৭২৩-৪৮) এই সম্প্রদায়ের কর্মতৎপরতার যুগ। তাদের সম্পর্কে বেশ কিছু প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায়; এই তথ্যগুলো পুরোপুরি সত্য না হলেও তাদের ধর্মতাত্ত্বিক প্রধান নীতিগুলি বোঝার জন্য যথেষ্ট। এই সকল

২. *তাবারী*, ১খ, ৩০৭২
৩. *তাবারী*, ১খ, ৩১৬৯, ৩১৭৮
৪. Ritter সম্পা. *কিতাব আল ফিরাক*: আশ-শী আ, পৃ. ৫

বিবরণ হতে এটা সুস্পষ্ট যে ইতিযাল নীতি হতে মুতাজিলাদলের সৃষ্টির সূচনা। ওয়াসি'ল প্রথমে এই মতবাদকে রূপদান করেন এবং পরে আমরকে তার শিক্ষার অনুসারী করেন। এইভাবেই ই'তিযালের ধারণার উদ্ভব বলে আজ-খায়্যাত বর্ণনা করেছেন। মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কেউ কাবীরা গুনাহ্ করলে সে ফাসিক* ও ফাজির** হয়। কিন্তু এসব বিশেষণের তাৎপর্য সম্বন্ধে মতানৈক্য ঘটে।

যেমন — খারিজিদের মতে, যে ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ করে সে কাফির, মুরজিয়াদের মতে ফিসক ও ফুজ্জুর সত্ত্বেও সে মু'মিন। তবে হাসান আল-বাস'রী ও তার সঙ্গীরা তাকে মুনাফিক (কপট) বলে বর্ণনা করেন। ওয়াসি'ল দেখিয়েছেন যে, কুরআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে কাবীরা গুনাহ করা পাপীকে মু'মিন বা কাফির কিছুই বলা যায় না। সুতরাং সে মু'মিনও না, কাফিরও না। কিন্তু যে পর্যন্ত মুনাফিকে'র মুনাফিকী ধরা না পড়ে, সে পর্যন্ত সে আপাত মানুষের কাছে মু'মিন, কাজেই আল-হাসান যেমন তাকে মুনাফিক গণ্য করতে চান তা মূলত অসম্ভব। সুতরাং একমাত্র সম্ভব পথ হল ফাসিক'কে মধ্যবর্তী অবস্থায় (মানযিলাতুন-বায়না'ল-মানযিলাতায়ন) অবস্থানকারী বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত করা। ওয়াসিল যে কথোপকথন দ্বারা আমরকে ই'তিযাল নীতির পক্ষপাতী করেন বলে ধারনা করা হয়, তাতেও একই ধারণা পাওয়া যায়[৫]- এ সকল বিবেচনার পিছনে রাজনৈতিক নানা সমস্যার প্রভাব আছে। 'মানযিলাতুন বায়না'ল-মানযিলাতায়ন' নীতি নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার ফল না; বরং হযরত আলী (রা.)-র খিলাফাতকে কেন্দ্র করে যে কলহ-বিবাদ দানা বেধে উঠে, যে সকল লোক তাতে যোগদান করে, তাদের সম্বন্ধে পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে এই ই'তিযাল নীতির উদ্ভব হয়। ওয়াসিল ও আমরের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যে সামান্য তথ্য পাই তাতে আলী, তালহা, যুবায়র ও আয়শা (রা.)-এর প্রশ্ন বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে। এক্ষেত্রে তারা যে একটা মূল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ওয়াসি'ল ও আমর এই কলহ সম্পর্কে তাদের আলোচনায় কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন নাই।[৬] তাদের মতে আলী, তালহা, যুবায়র ও আয়শা (রা.) মূলত প্রকৃত ধার্মিক মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধে, তার ফলে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন; এদের দুই দলই ন্যায়পন্থি হতে পারেন না। অবশ্যেই দুই দলের একদল গুনাহ করেছেন। কিন্তু সেই গুনাহকারী দল কারা তা আমরা জানি না। কাজেই যিনি তা জানেন, তার উপরেই তাদের ব্যাপার আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু তাদের কোনো দলকে আমরা সঠিক অর্থে প্রকৃত মু'মিন বলে গণ্য করতে পারি না। ফলে এদের একজন যদি বিপক্ষ দলের কোনো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে

৫. আস-সায়্যিদু'ল-মুর্তাদা. *আমালী*, ১খ, ১১৪গ,-ই,ল-মুর্তাদা, *আল-মু'তাজিলা*, পৃ-২২প। উৎস সম্ভবত আল-খায়্যাত'।
৬. *কিতাবুল-ইন্‌তিসা'র*, পৃ. ৯৭–৯৮

সাক্ষ্য দেন আমরা সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি না; আপেক্ষিকভাবে একজনের তুলনায় অন্যজন ফাসিক।[৭] আহলুল-হাদিসদের মতে ওয়াসিলের চেয়েও আমর অধিক কঠোরতা প্রদর্শন করেন। সমাজের যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যাপারে তিনি এই দলগুলোর কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন বলে কথিত আছে;[৮] কারণ তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষকেই অপরাধী (ফুসসাক) ঘোষণা করেন। কাজেই ওয়াসিল ও আমরকে কখনো কখনো খারিজি বলে ভুল করা হয়ে থাকলেও বিস্ময়ের কিছু নাই।[৯]

সে যা হোক, আলী (রা.) সম্পর্কে মুতাজিলা নেতাদের মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নির্ভুলভাবে অবস্থাটা বুঝতে হলে দেখা দরকার যে—

১. ওয়াসিল এবং সমস্ত মুতাজিলা ছিল উমায়্যাদের বিরোধী এবং

২. উসমান (রা.) ও তার হত্যাকারীদের সম্পর্কে ওয়াসি'ল কতকটা দ্ব্যর্থবোধক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।[১০]

প্রকৃতপক্ষে মদীনার আলী অনুসারীদের সাথে ওয়াসিলের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল;[১১] যায়দীরা আলী (রা.)-কে তাদের একজন নেতা বলে ভক্তি করেন এবং যায়দী ধর্মতত্ত্ব মূলত ওয়াসিলের ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কেই যে এটা সত্য তা না, বরং রাজনৈতিক মতবাদের সাথেও এর সম্পর্ক আছে। চরমপন্থি শীয়াদের ন্যায় যায়দীরা এই মত পোষণ করে না যে, প্রথম খলীফা আবূ বাকর (রা.) ও দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা.) অন্যায়ভাবে অধিকার লাভ করেছিলেন। ওয়াসিলসহ সকল মু'তাজিলীরা আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকে বৈধ বলে স্বীকার করেন,[১২] আবু বাকর, উমার কিংবা আলী (রা.)-কার দাবি শ্রেষ্ঠতর, এই প্রশ্নটি তিনি অমীমাংসিত রেখে দেন, কিন্তু উসমান (রা.) অপেক্ষা আলী (রা.)-র দাবিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আলী (রা.) সম্পর্কে তার এই দৃষ্টিভঙ্গি কিঞ্চিৎ জটিল ও এটা চরমপন্থি শীয়াদের কাছে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং যুগপৎ উমাইয়াদের প্রতি তার বৈরীভাবের নিদর্শন। একে শুধু এ-ভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এই পুরো ঘটনাপ্রবাহ দৃশ্যত বিসদৃশ চিন্তাধারা একটা সাধারণ কেন্দ্রে মিলিত হয়, সেটি হল 'আব্বাসী আন্দোলন'। ওয়াসিলের মনোভাবকে আব্বাসীদের পক্ষভুক্ত

---

৭. বাগদাদী, *কিতাবুল-ফারক*, পৃ. ১০০

৮. *তরীখ বাগদাদ*, ১২খ, ১৭৮; আল-বাগদাদী, *কিতাবুল-ফারক*, পৃ. ১০০

৯. ইসহক ইবন সুওয়াদ আল — আদাবীর কবিতাংশ, আল-জাহিজ, বায়ান, ১খ, পৃ. ১৩

১০. *কিতাবুল-ইনতিসার*, পৃ. ৯৭-৯৮)

১১. ইবনুল-মুরতাদা, *আল-মুতাজিলা*, পৃ. ২০)

১২. ইবন আবী হাদীদকৃত *নাহজুল-বালাগা*'র ভাষ্য, কায়রো হি. ১৩২৯, ১খ, পৃ. ৩